Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১৬ জানুয়ারি, ২০২৪

৪৭ বর্ষ ৩ সংখ্যা ১৫ জানুয়ারি, ২০২৪, সোমবার, ২৯ পৌষ, ১৪৩০

পদযাত্রা : ‘বিপন্ন আমাদের দেশ বাঁচাও’

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১২ জানুয়ারি, বর্ধমান : বিপন্ন আমাদের দেশ ভারতবর্ষ, বিপন্ন দেশের গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা। আরএসএস, বিজেপি ধর্মের নামে, ভাষাভাষীর নামে দেশ, দেশের ঐক্যকে ভেঙে ফেলার ষড়যন্ত্র করছে। রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার লুঠের রাজনীতি করছে। রাজ্যে কাজ নেই। এই দুই সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে বামপন্থী গণসংগঠনসমূহ বর্ধমান শহর-১ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে বর্ধমান শহরে ৩০, ৩১, ৩২ নং ওয়ার্ডে এক সুসজ্জিত পদযাত্রা সংগঠিত হয়। এই পদযাত্রার পুরোভাগে ছিলেন গণআন্দোলনের পূর্ব বর্ধমান জেলার নেতৃত্ব তাপস সরকার, অপূর্ব চ্যাটার্জী, মহিলা আন্দোলনের নেতৃত্ব তথা মহিলা ফ্রন্টের পূর্ব বর্ধমান জেলার সম্পাদিকা সুপর্ণা ব্যানার্জী, শ্রমিক আন্দোলনের নেতা নজরুল ইসলাম সহ গণসংগঠনগুলির অন্যান্য নেতৃত্ব। মিছিলে থেকে স্লোগান ওঠে বেকারদের কাজ দিতে হবে, রাজ্যের দুর্নীতির মাথাদের গ্রেপ্তার করতে হবে, মহিলাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে এবং আর এস এস, বিজেপি সরকারের দেশবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আরও বড় আন্দোলন গড়ে তুলে আগামী লোকসভা নির্বাচনে ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে জোরদার করতে হবে।

বিজ্ঞান মঞ্চের উদ্যোগে আন্দোলনের পথে ‘শশাঙ্ক বিল বাঁচাও কমিটি’

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৩ জানুয়ারি : বর্ধমান শহরের কিডনি, ফুসফুস, ব্রিটিশ আমলের ৩০০ বিঘা জলাশয় ‘শশাঙ্ক বিল’ এখন জমি হাঙরদের নজরে। বর্ধমান শহরে এ নিয়ে চলছে জোর চর্চা। ‘শশাঙ্ক বিল বাঁচাও’ ব্যানারে সরব হয়েছে বিজ্ঞান মঞ্চ। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয় বর্ধমান শহরের আনন্দ পল্লী, শ্রীপল্লী ও দুই নম্বর ইছলাবাদ জুড়ে যে জলাশয়, তাকেই বলা হয় শশাঙ্ক বিল। প্রায় ৩০০ বিঘা জুড়ে এই জলাভূমি কচুরিপানা ও নানা উদ্ভিদে পরিপূর্ণ। শীতের পরিযায়ী গাখি, ভোঁদড়, জলজ ও উভচর প্রাণী সহ এক অনন্য প্রাকৃতিক পরিবেশ নিয়ে এই জলাশয় দীর্ঘদিন অবস্থান করছে। শহরের নোংরা জলকে পরিশোধিত করে গ্রাউন্ড ওয়াটারকে পুষ্ট করে এই জলাভূমি। শহরের মাঝখান বরাবর বয়ে যাওয়া শীর্ণ, ক্লিষ্ট বাঁকা নদীর সঙ্গে রয়েছে এর যোগ। বর্ষায় বাঁকা নদীর পর্যাপ্ত অতিরিক্ত জলকে ধরে রাখে। এই পরিস্থিতিতে শশাঙ্ক বিল ভরাট হলে বাঁকা নদী ক্ষতিগ্রস্ত হবে, বর্ষাকালে বর্ধমান শহর বিপর্যস্ত হবে।

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের জেলা কমিটির উদ্যোগে ৯ জানুয়ারি শশাঙ্ক বিল বাঁচানো এবং জলাভূমি রক্ষায় পথসভার আয়োজন হয়। আনন্দপল্লীর বড়নীলপুর মোড়ে পথসভায় সভাপতিত্ব করেন ডাঃ তুষার কান্তি বটব্যাল। প্রারম্ভিক ভাষণে বিজ্ঞানমঞ্চের জেলা সম্পাদক আশুতোষ পাল শশাঙ্ক বিল ও তার গুরুত্বের কথা বলেন। তিনি সারা রাজ্যে বিভিন্ন জেলায় কিভাবে বিগত কয়েক বছরে নানা ভাবে জলাশয়গুলি বুজিয়ে ফেলা হয়েছে তার তথ্য তুলে ধরেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বাঁকা নদীর সংস্কারের কথাও তুলে ধরেন। কার্যকরী সভাপতি চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সারা ভারত বিজ্ঞান চেতনা প্রসারের প্রেক্ষিতে জীবন ও জীবিকার জন্য বিজ্ঞান, যুক্তিবাদ ও

—এরপর চারের পাতায়

এসএফআই-এর বর্ধমান জেলা কনভেনশন পহলানপুরে : প্রস্তুতি তুঙ্গে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৩ জানুয়ারি : ভারতের ছাত্র ফেডারেশন (এসএফআই)-এর পূর্ব বর্ধমান জেলা কনভেনশন শুরু হবে আগামী ১৯ জানুয়ারি রায়না-২ ব্লকের পহলনপুর বাজারে প্রকাশ্য সমাবেশের মাধ্যমে। উপস্থিত থাকবেন সংগঠনের সর্বভারতীয় নেত্রী দিপ্সিতা ধর ও ঐশী ঘোষ। এই কনভেনশনকে সামনে রেখে জেলায় প্রস্তুতি তুঙ্গে উঠেছে। পাশাপাশি জোর কদমে চলছে সংগঠনের পুনর্গঠনের কাজ। পূর্ব বর্ধমান জেলায় বিগত এক মাসে গ্রাম থেকে শহর, ইউনিট থেকে লোকাল কমিটির সর্বত্র পুনর্গঠনের কাজ চলেছে। এখনও অবধি ১০০ টির বেশি ইউনিট, ১০টি লোকাল কমিটি পুনর্গঠনের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় সহ আরও বেশ কয়েকটি ইউনিট ও ১৪টি লোকাল কমিটি পুনর্গঠনের কাজ সম্পন্ন হবে। গ্রাম শহর সর্বত্রই ইউনিট কনফারেন্স, লোকাল কমিটির কনভেনশন শেষে রাজ্য সম্মেলন, অনুষ্ঠিতব্য জেলা কনভেনশন ও কনভেনশনের শুরুতে ছাত্র সমাবেশের প্রচার করা হয়েছে। ক্যাম্পাস ও বাজার এলাকায় ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ, প্রচার-পোস্টারিংয়ের কাজগুলি চলছে। গত ১২ জানুয়ারি জেলার তিনটি লোকাল কমিটি জামালপুর, বর্ধমান শহর, সদর ১-এর কনভেনশন হয়। বর্ধমান শহর ও জামালপুরে প্রতিনিধিদের নিয়ে মিছিল করা হয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে। সম্মেলনকে সামনে রেখে সংগঠনের বৃত্তকে বাড়ানোর উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ক্যাম্পাসের নতুন ছাত্রছাত্রীদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে প্রতিনিধিরা, ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে চলছে পোস্টারিং, দেওয়াল লিখন। জেলা সম্পাদক অনির্বাণ রায়চৌধুরী জানান গোটা জেলা জুড়ে বৃহৎ অংশের ছাত্রের কাছে পৌঁছে আমাদের সংগঠনের কথা ছড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে ও বাইরে ‘ক্যাম্পাস বিক্রি ও শিক্ষাক্ষেত্রে বিভাজন’-এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আগামী লড়াইয়ের বার্তা দিতে আমাদের এই কনভেনশনের স্লোগান হিসেবে আমরা নির্দিষ্ট করেছি ‘ক্যাম্পাসের অন্ধকারে আগুন জ্বালো’, ‘শিক্ষা বিক্রির ও বিভাজনের খেলা বন্ধ করো’।

৭৫ বছর উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে ক্লাইভ লয়েড

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১২ জানুয়ারি : কালনার সাতগাছিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ৭৫ বছর উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে আসেন বিখ্যাত ক্রিকেটার ক্লাইভ লয়েড। যিনি ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দলের হয়ে খেলেছেন। ১৯৭০-এর দশক ও ১৯৮০-এর দশকের ওয়েস্টইন্ডিজ দলের দলনেতা ছিলেন।

—এরপর চারের পাতায়

শ্রমিক সংগঠনের রক্তদান শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১০ জানুয়ারি : শ্রমিকরা শুধু তাদের কাজের মধ্যেই থাকেন না। তাঁরা মানবসেবার স্বেচ্ছায় রক্তদানও করেন। তার প্রমাণ মিললো এদিন কালনা থানার মালতিপুর মোড়ে অনুষ্ঠিত রক্তদান শিবিরে। ১০ জন মহিলা সহ ৬১ জন শ্রমিক স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। সিআইটিইউ-এর কালনা-১ সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে শ্রমিক নেতা প্রয়াত খগেন রায় স্মরণে এই শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুকান্ত কোঙার। তাপস চ্যাটার্জী, কুতুবউদ্দিন শেখ, অরুণাভ চক্রবর্তী, আলিম শেখ, সুকুল শিকদার, বীরেন ঘোষ প্রমুখরা শিবিরে দীর্ঘক্ষণ উপস্থিত থেকে রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেন। উদ্বোধনকালে সুকান্ত কোঙার বলেন, রক্তদান শিবিরগুলি থেকে সংগ্রহ করা রক্ত শুধু মুমূর্ষু রোগীকে জীবনদানই করে না। কুচক্রীদের অভিসন্ধিমূলক জাতপাতের বেড়া ভেঙে দিয়ে মানুষের সাথে মানুষকে মিলিয়ে দেয়।

শিক্ষক কম থাকায় অভিভাবকদের বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১১ জানুয়ারি, মেমারি : কুচুট প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক কম থাকার কারণে অভিভাবকরা স্কুলের গেট বন্ধ করে ও পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন এদিন। জরুরি পরিষেবাকে ছাড় দিয়ে এই অবরোধ চলে। মেমারি দু'নম্বর ব্লকের অন্তর্গত কুচুট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ১৭০ জন ছাত্রছাত্রী এবং তিনজন শিক্ষক ও শিক্ষিকা থাকার কারণে পড়াশোনার ঘাটতি হচ্ছে বলে অভিভাবকরা দাবি করেন। কালনা বর্ধমান মেন রোডে প্রায় ৬০ মিনিট অবরোধ চলে। আগামী মঙ্গলবার আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান হবে বলে জানালেন অভিভাবকগণ।

গোপীকান্ত কোঙারের জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা : গবেষক ও ইতিহাসবিদ, মেমারি কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ডঃ গোপীকান্ত কোঙার গত ৮ জানুয়ারি ভোর ৪টায় প্রয়াত হয়েছেন। গোপীকান্ত কোঙারের জন্ম ১৯৪৮ সালে পূর্ব বর্ধমান জেলার সদর থানার শক্তিগড়ে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজতত্ত্বের উপর গবেষণা করেন। গ্রামীণ সমাজ, গ্রাম বাংলার মাটি, পরিবেশ এবং মানুষ তাঁর চর্চার বিষয় ছিল। মানুষকে জানার অদম্য বাসনা তাঁর কৈশোর জীবন থেকেই। চাকুরি জীবন শুরু হয় সেইরকম বাঁকুড়া জেলার একটি গ্রামীণ কলেজে অধ্যাপনার মধ্য দিয়ে। সেখানে এক দশক কাটিয়ে চলে আসেন বর্ধমানের মেমারি কলেজে। কলেজের প্রতিষ্ঠা থেকেই মেমারি কলেজের অধ্যক্ষ। মানুষের ইতিহাস, জীবন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানার আগ্রহে ডঃ গোপীকান্ত কোঙার জেলায় এবং জেলার বাইরে ধারাবাহিক অনুসন্ধান চালিয়েছেন। ‘বর্ধমান জেলার মেলা ঃ সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনা’ তাঁর গ্রন্থটি সুধীজনদের কাছে আদৃত হয়েছে। তিন দশকের বেশি বর্ধমান জেলার প্রায় সর্বত্র ঘুরে ক্ষেত্রানুসন্ধানে ব্রতী ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহটি দেখার মতো। সেই সংগ্রহ থেকে কয়েকটি খণ্ডে সম্পাদনা করেছেন ‘বর্ধমান সমগ্র’। যেখানে যুগ যুগ ধরে ফেলে আসা, হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসকে দুই মলাটের মধ্যে প্রকাশ করেছেন। এছাড়াও বর্ধমান জেলার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন। মেমারি কলেজের সফল রূপকার বলা যায় তাঁকে। আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চায় বাস্তবভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন অগ্রণী মানুষ হিসেবে তাঁকে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না।

স্মরণসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৩ জানুয়ারি : গন্ধবণিক সেবা সমিতির উদ্যোগে বর্ধমান টাউনহলে প্রয়াত সুভাষ বণিক ও আলপনা বণিক-এর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। স্মৃতিচারণ করেন রামকৃষ্ণ মিশন সারদা মিশন ও পরমানন্দ মিশনের মহারাজরা। এছাড়াও অমরচাঁদ কুণ্ডু, মথুরামোহন বণিক এবং বর্ধমানের বিধায়ক ও পৌরসভার পৌরপতি উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন গন্ধবণিক সেবা সমিতির সাধারণ সম্পাদক শীর্ষেন্দু সাধু। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও সুভাষ বণিক-এর পরিবার পরিজনেরা।

নতুন চিঠি

১৫ জানুয়ারি, ২০২৪

সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ফসল তোলার তোড়জোড়

আদবানির উস্কানিমূলক রথযাত্রা, শতাব্দীপ্রাচীন বাবরি সৌধ ধ্বংস, করোনার দুঃসময়ে ভূমিপূজার মধ্য দিয়ে স্বাধীনোত্তর ভারতে যে উগ্র সাম্প্রদায়িক রাজনীতির চাষবাস চলেছিল তার ফসল তোলার তোড়জোড় চলছে। আগামী ২২ জানুয়ারি অযোধ্যার রামমন্দিরে মূর্তির 'প্রাণপ্রতিষ্ঠা'র তারিখ ধার্য হয়েছে। ধর্মপ্রাণ মানুষ কাজ পেতে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে মন্দিরে যায়, আর নিজের চেষ্টায় তা অর্জন করতে সক্ষম হলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেয়। ধর্ম তাই মানুষের এমন এক ভাবাবেগ যাকে লঘু করে দেখা অনুচিত। কিন্তু অযোধ্যায় যা হচ্ছে তাকে ধর্মের আবেগের প্রতি শ্রদ্ধা বললে ভুল হবে। এ হল ধর্মকে কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক ডিভিডেন্ড তোলার হীন কৌশল। ধর্ম ব্যক্তিমানুষের নিজস্ব, তার একান্ত ব্যক্তিগত আবেগ ও উপলব্ধির সঙ্গেই তার সম্পর্ক। ধর্মের অহঙ্কারী প্রদর্শন ধর্মকে ছোট করে, অন্য সম্প্রদায়ের আবেগকে অগ্রাহ্য করে। এসব করতে চাওয়া নিতান্ত অশোভন, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে এ কাজে রাষ্ট্রের উপস্থিতি সংবিধানবিরুদ্ধ।

অথচ তা-ই হচ্ছে। দেশের প্রধানমন্ত্রী নিজের 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ' শ্লোগান ভুলে ক্ষমতা দখলের অভিপ্রায়ে হিন্দুরা কোন ফুলে তুষ্ট হবে সেই হিসেব করে মন্দির উদ্বোধনে ও তার প্রচারে আদাজল খেয়ে নেমেছেন। ধর্ম এখানে গৌণ, উপলক্ষ্য মাত্র। তা না হলে যোশীমঠ, দ্বারকা, শৃঙ্গেরি ও পুরী চার মহাপীঠের শঙ্করাচার্যরা সমস্বরে নির্মাণ সম্পূর্ণ হবার আগেই মন্দির উদ্বোধনের বিরোধিতা করতেন না। শুধু বিরোধিতা নয়, দুজন শঙ্করাচার্য অনুষ্ঠান বয়কট করার ডাক দিয়েছেন। বোঝাই যাচ্ছে, মন্দিরকেন্দ্রিক কর্মকাণ্ডে ধর্মগুরুরা ব্রাত্য। ধর্মের ভেকে গেরুয়া শিবিরের ক্ষমতা দখলের এজেন্ডাই যে প্রধান তা আগেই স্পষ্ট হয়েছিল যখন ২০২০ সালের ভিত্তিস্থাপন অনুষ্ঠানের আগে প্রমোদ যোশী অভিযোগ করেছিলেন, হিন্দু মহাসভার কাছ থেকে মন্দির নির্মাণের কাজ বিজেপি এবং সঙ্ঘপরিবার হাইজ্যাক করে নিয়েছে।

এ ছাড়াও অন্য কয়েকটি বিষয় খেয়াল রাখা দরকার। ওই মন্দিরে বিগ্রহ স্থাপন হলেই দেশে রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠা হয়ে যাবে না। রামরাজত্ব সবদিক থেকে ভালো ছিল না। তবু রামরাজত্ব বলতে আমরা সাধারণত বুঝি এমন এক শাসনব্যবস্থা যেখানে সব প্রজারা নিরাপদ ও সামাজিক ন্যায়বিচার সুলভ। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের ট্র্যাকরেকর্ড দুক্ষেত্রেই খারাপ। বিগত এক দশকে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বেড়েই চলেছে, আর নারী, শিশু, দলিত, পিছরেবর্গের ওপর নিগ্রহ ক্রমবর্ধমান। মোদির 'আদর্শ' অর্থনীতির বেলুন চুপসে গেছে, দারিদ্রের মাপকাঠিতে দেশের পতন ঠেকানো যাচ্ছে না। দুর্নীতির ব্যাপকতা বেড়েছে। মন্দির নির্মাণের ১৪০০ কোটি টাকা নিয়েও দুর্নীতি হয়েছে, আর এ অভিযোগ বিরোধীদের নয়, স্বয়ং নির্মোহী আখড়ার। এইসব অস্বস্তিকর প্রশ্ন এড়াতে ফাঁদ পেতেছে বিজেপি—অনুষ্ঠানে কে গেল আর কে গেল না তার নিরিখে বিভাজনের ফাঁদ। যারা ধর্মনিরপেক্ষতার সঙ্গে আপস করতে চায় না সে সব রাজনৈতিক দল তারা তাদের অবস্থান স্পষ্ট করছে। আর যারা দুধ তামাক দুটোই খেতে চায়, ধর্মীয় মেরুকরণে যাদের লাভ, যেমন এ রাজ্যের শাসকদলের, তারা জল মাপছে। মানুষকে তাই সজাগ থাকতে হবে, ধর্মকে রাজনৈতিক স্বার্থে কাজে লাগানোর অপচেষ্টা রুখতেই হবে।

প্রাচীন লোকসঙ্গীতের ধারা ঝুমুর

লিপিকা সাহা ঘোষ

বঙ্গদেশের পশ্চিমাংশের পাথুরে মাটি ও জঙ্গলাকীর্ণ বিস্তীর্ণ রাঢ় অঞ্চলের আদিবাসীদের নিজস্ব সংস্কৃতি ঝুমুর। যা নৃত্য, গীতের সমাহার। পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা; ঝাড়খণ্ড রাজ্যের সাঁওতাল পরগণা, সিংভূম, রাঁচি, হাজারিবাগ, পালামৌ, গিরিডি, ধানবাদ ও বোকারো; উড়িষ্যা রাজ্যের ময়ূরভঞ্জ, সুন্দরগড়, কেওনঝড়, সম্বলপুর; আসামের চা-বাগান সহ বাংলাদেশের সীমান্ত বরাবর বিশাল অঞ্চলের মানুষের হৃদয় দীর্ঘদিন আন্দোলিত ঝুমুর গান এবং নাচে। 'ঝুম' (যূথ) আর 'অর' (সুর) শব্দ দুটি মিলে হয়েছে ঝুমুর। প্রাচীনকালে এই অঞ্চলের মানুষ ঝুম অর্থাৎ যূথবদ্ধ ভাবে থাকার জন্য যে সুরে আনন্দ প্রকাশ করত তা-ই ঝুমুর।

ঝুমুর গান স্থানভেদে 'ঝুম্যাইর', 'গাহা ঝুমার' বা 'ঝুমার'। সুমিষ্ট তাল ও ছন্দে ধ্বনিত ঝুমুর পাহাড় ও সবুজ বনানীর আনাচকানাচ আন্দোলিত করে। বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও গবেষক সুকুমার সেন ঝুমুরকে বলেছেন নাট্যগীতির একটি প্রাচীন ধারা। তাঁর মতে যাকে সংস্কৃতে 'জাম্ভলিক' বলা হয় বাংলায় তা ঝুমুর। চর্যাপদের বিভিন্ন পদের সঙ্গে ঝুমুর গানের মিল পাওয়া যায়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মতে বাংলায় মধ্যযুগে ঝুমুর শব্দের প্রচলন ছিল।

গোরক্ষবিজয়ের 'ঝুমরে ঝুমরে শব্দ ওঠে'। পদকল্পতরুর 'যুবতী যূথ শত গায়ত ঝুমরী'। বিদ্যাপতির 'গওই সহি লোরি ঝুমরী সমন আরাধনে যাঞআ', গোবিন্দ দাসের 'মদন মোহন হরি মাতাল মনসিজ/ যুবতী যূথ গাওত ঝুমরী', সঙ্গীত দামোদরের 'প্রায়ঃ শৃঙ্গারবহুল মাধ্বিক মধুরামৃদু/একৈব ঝুমরলোকে বর্ণাদিনিয়মোজ্ঝিতা' প্রমাণ করে ঝুমুর হাজার বছর আগেও প্রচলিত ছিল বাংলায়।

প্রাচীন ভারতে সংস্কৃত ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে দ্রাবিড়, আলপিয়ান, প্রোটো-অস্ট্রালয়েডদের বসবাসের ফলে নব্যভারতীয় জনগোষ্ঠীর উদ্ভব হলেও ভাষার ক্ষেত্রে মিশ্র জনগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছিল। ঠিক এই সময় আর্য-অনার্য সঙ্গীতের সংমিশ্রণে সৃষ্টি হয়েছিল লোকসঙ্গীত। লোকসঙ্গীতের অন্যতম ধারা 'ঝুমুর' যা পূর্ব ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের কুর্মি, মাহাত, কুমোড়, রাজওয়ার, ঘটাল, হাঁড়ি, মুচি, সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বিনোদনের সুর।

ঝুমুর নৃত্যগীতে নারী পুরুষ উভয়েই অংশগ্রহণ করে। পুরুষরা মাদল, ঢোল, বাঁশি ও করতাল সহ ৬ মাত্রার নির্দিষ্ট তালে (উত্তর ভারতীয় দাদরার মত নয়) গান করে, যার সঙ্গে মেয়েরা সুর মেলায় আর সারিবেঁধে কোমর ধরে নির্দিষ্ট ভঙ্গিমায় নাচ করে। ঝুমুর গান আগে ডহরওয়া, পতরতুলা, বেগাড়ি, পাটিয়া মেধা, রিঝামাঠা, ঝুমুর, ঝুমটা, একডাড়িয়া, গোলোয়ারি, নাগপুরিয়া, তামাড়িয়া, শিখারিয়া, পাঁচপরগণিয়া, মুন্দিয়ারি প্রভৃতি সুর ও তালে গীত হত। এখন তার অধিকাংশই বিলুপ্ত।

বিষয়বস্তু ও রচনার বৈশিষ্ট্য অনুসারে ঝুমুর গান বিভিন্ন রকম হয়। টাঁড়, উধোয়া, ডমকচ, ডহরিয়া, দাঁড় প্রভৃতি ঝুমুর হল লৌকিক ঝুমুর, সুরবৈচিত্রহীন আকস্মিকভাবে রচিত তিন বা তিনের কম কলিযুক্ত। অঞ্চলবিশেষে ঝুমুর হল বরাবাজারিয়া, বাগমুড়িয়া, ঝালদোয়া, সিলিয়াড়ি, গোলায়ারি, তামাড়িয়া ঝুমুর। সুর-তাল-নৃত্য বিশেষে বাউলছোঁয়া, ঢুয়া, কীর্তনছোঁয়া, দাঁড়শালিয়া, খেমটি, আড়হাইয়া ঝুমুর উল্লেখ্য। ভাদরিয়া, চৈতারি, আষাঢ়ি, বারমেসা ঝুমুর হল ঋতুপর্বের ঝুমুর। জাতিভেদে কুড়মালি, মিগুরি ঝুমুর।

মার্জিত ভাষায় রচিত ঝুমুর হল দরবারী ঝুমুর। এর বিষয়বস্তু দেহতত্ত্ব, কৃষ্ণলীলা, পুরাণ ইত্যাদি। গানগুলি ভণিতাযুক্ত, পয়ার বা ত্রিপদী ছন্দে রচিত।

প্রথমদিকে এই ধরনের ঝুমুর গানের বিষয়বস্তু ছিল শুধুই লৌকিক প্রেম, শৃঙ্গাররসে সিক্ত। যা ছিল অভিজাতদের কাছে অশ্লীলতার দোষে দুষ্ট। বাংলায় মুসলমান শাসনকালে নিম্নবর্ণের বহু মানুষ ধর্মান্তরিত হলে ঝুমুর গানও মুসলমানদের চর্চায় আসে। তাই আজও মেদিনীপুর, বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া অঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে বিয়ের সময় ঝুমুর গান গাওয়ার রীতি আছে।

প্রথমদিকে মুখে মুখে গাওয়া হত বলে ভণিতার চল ছিল না। তাই রচয়িতার নাম পাওয়া যায় না। উত্তরচৈতন্য যুগে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে ঝুমুরগান ভণিতাযুক্ত হল, ভাষার শৈল্পিক উৎকর্ষ বাড়ল, রাধাকৃষ্ণের কাহিনি বিষয়বস্তুর অন্তর্গত হল। ঝুমুরে ভক্তিগীতি ও কীর্তনের প্রভাব পড়ল। বৈষ্ণব-প্রভাবিত অঞ্চলের সামন্তরা দরবারে ঝুমুরের আসর বসাতে শুরু করল। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে ভাষার পরিমিতিবোধ সহ কাব্যধর্মী ঝুমুর রচিত হল। স্বাধীনতা-পরবর্তী ঝুমুরগানে যুক্ত হল আধ্যাত্মিকতা, সমাজ ও রাজনীতি। সুললিত ঝুমুর হয়ে ওঠে প্রতিবাদের ভাষা।

বর্তমানে ঝুমুর নিয়ে চর্চা ও গবেষণা বেড়েছে। আধুনিককালের ঝুমুর রচয়িতা সলাবত মাহাত, কৃত্তিবাস কর্মকার, ধ্রুব সিং সর্দার, কুচিল মুখোপাধ্যায়, সদানন্দ সিং মুড়া, জগত কবিরাজ, গদাধর চৌধুরী, ভবপ্রীতানন্দ ওঝা, রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলী, সৈকত রক্ষিত প্রমুখ শুধু সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে গল্পধর্মী ঝুমুর রচনা করেছেন তাই নয়, এঁদের অবদানে ঝুমুর আধুনিক শিক্ষিতসমাজেও আস্বাদনীয় হয়ে উঠেছে। তাই আজও সমগ্র বাংলাসহ উত্তর-পূর্ব ভারত জুড়ে মাদল বাজে "ধিধিগ ধি তাং।/ তিদিগ তি তাং" বোলে, আর সেই বোলের সঙ্গে কোমর বেঁধে "যুবতী যূথ শত গায়ত ঝুমরী"।

লেখিকা লিপিকা সাহা ঘোষ, শিক্ষিকা। প্রকাশিত বই 'ইতিহাসে তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ', 'তাল লয় ছন্দে সমাজদর্পণ', 'তথ্যচিত্র : ইতিহাস তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ'।

গণআন্দোলনের মহিলা নেত্রী মহারানী কোঙার

কাজী আবদুল করিম

রাণীদির জন্ম হয় ১৯৩৩ সালের ২৩ নভেম্বর হুগলী জেলার আরামবাগ থানার মলয়পুর গ্রামে। পিতা জগজীবন সামন্ত এবং মাতার নাম বীণাপানি সামন্ত। এঁদের এক পুত্র এবং পাঁচ কন্যা। তৃতীয় কন্যা মহারাণী সামন্ত। শেষ দুই বোন এখনো জীবিত আছে। মহারানীর যখন ১৩ বছর বয়স তখন তাঁর বিবাহ হয় কৃষক নেতা বিনয় কোঙারের সঙ্গে। বিবাহের পর থেকেই দেখতেন তাঁর স্বামী কমিউনিস্ট পার্টির কাজে যুক্ত। গোপন চিঠিপত্র, হিসাবপত্র রাখা সহ নানা কাজে যুক্ত। পার্টি বেআইনি সেই অবস্থায় তাঁর কাজকর্ম দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে রানীদিও পার্টির প্রতি আকৃষ্ট হন। শ্বশুরমশাই শরৎ কোঙার একবার বৌমাকে ডেকে বললেন—"বৌমা তোকে বিয়ে দিয়ে আনলাম ছেলেকে সংসারের পথে টেনে আনার জন্য। কিন্তু তুইও চলে গেলি ওর সাথে পার্টি করতে!" বড় ছেলে হরেকৃষ্ণ কোঙার তো সেই কবেই চলে গেছে সংসার ছেড়ে পার্টির কাজে।

১৯৩৮ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। ১৯৬২ সালের ২০ অক্টোবর চীন-ভারত সীমান্তে যুদ্ধ শুরু হয়, বামপন্থী কমিউনিস্ট নেতাদের চীনের দালাল আখ্যা দিয়ে ধরপাকড় শুরু হয়। বর্ধমান জেলার পার্টি দপ্তর মোবারক বিল্ডিং-এ গুণ্ডাবাহিনী, পুলিস, সি.আর.পি.এফ-এর সহযোগিতায় আক্রমণ করে। বিনয় কোঙার, রামনারায়ণ গোস্বামী, কৃষ্ণচন্দ্র হালদাররা পার্টিকর্মীদের নিয়ে প্রতিরোধ করেন। বিনয় কোঙারের কপালে ইট এসে লাগে, তিনি রক্তাক্ত হন। পুলিশ গুণ্ডাবাহিনীকে না ধরে পার্টিনেতৃত্ব সহ কর্মীদেরই ধরে নিয়ে যায়। ছাত্রনেতা অরিন্দম কোঙারও গ্রেপ্তার হন। ৫৬ জনকে জেলে বন্দি করা হয়।

মাত্র কয়েকমাস হলো রামনারায়ণ গোস্বামীর বিবাহ হয়েছে। ঘোমটা মাথায় সেই নববধূ লতিকা গোস্বামী জেলখানার গেটে স্বামীকে দেখবার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন। তখন মহারানী কোঙারও তাঁর স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য এসেছেন—দুজনের পরিচয় হলো। দিদি-বোন সম্পর্ক তৈরি হলো। যা পরবর্তীতে আরও দৃঢ় হয়েছে। তখন রানীদি বর্ধমানের খালুই বিল মাঠের একটি বাড়িতে ছেলে-মেয়েদের নিয়ে থাকতেন। তিনি তাঁর সন্তানদের বলতেন, "তোদের বাবা জেলে গেছে

চুরি ডাকাতি করে নয়, আদর্শের জন্য।"

পরবর্তী সময়ে সত্তর দশকে সাঁইবাড়ি মামলায় বিনয় কোঙারকে ১৯৭০ সালের ২৯ এপ্রিল বর্ধমান টিকরহাটে জনসভা থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরদিন খোলা ট্রাকে বিনয় কোঙার, গোকুলানন্দ রায়কে চাপানো হয়। দুজনেই তখন বিধায়ক। তবু তাঁদের গায়ে খোঁচা দেওয়া হয়। গায়ে থুতু ছেটানো হয়। তখন রানীদি পুলিশ, সিআরপিএফ-দের ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে বলেছিলেন—'এ কেয়া হোতা হ্যায়, দেখতা নেহি...'

তখনও তিনি ভেঙে পড়েননি। তারপর একে একে অনেককেই গ্রেপ্তার করা হয়। রামনারায়ণ গোস্বামীকেও গ্রেপ্তার করা হয়। সেই সময় আবার দুই বোনের দেখা, সুখ-দুঃখের কত আলোচনা জেলগেটে হতো। রানীদি ছিলেন কমরেড, কমরেড মানে পাশাপাশি থাকা, কমরেড মানে সাথী, বন্ধু!

সত্তর দশকে তিনি ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসের মুখে দক্ষতার সঙ্গে পার্টি ও পরিবার সামলেছেন। সন্ত্রাসের দিনে মেমারির বাড়িতে বহু পার্টিকর্মী আশ্রয় নিতেন। তাদের থাকা, খাওয়ার ব্যবস্থা তিনি করতেন। তিনি লিখেছেন—"সেই সময় আমাদের বাড়িতে নুর, লুলু, শেখর, কল্যাণ এমন কত কমরেড আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁদেরকে বাড়ির একজন সদস্যের মতোই দেখতেন। সেইসময় দু'জন কর্মী হরিসাধন মণ্ডল ও তপন ভট্টাচার্য্যকে তাঁদের বাড়ির দরজা থেকে পুলিশ জোর করে ভ্যানে তুলেছিল। রানীদি এবং তাদের মেয়েরা ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের উদ্ধার করে বাড়ির মধ্যে নিয়ে আসেন।" রাণীদির বাবা জগজীবন সামন্ত একবার মেমারির বাড়িতে এসে বলেছিলেন—এত আক্রমণ তবু তোরা পার্টি কেন করছিস?" মহারানী উত্তরে বলেছিলেন, "বাবা, আদর্শের জন্য যদি জীবন যায় সে মৃত্যু আমার কাছে বড় গৌরবের। আমি মরলে দু'চারজনকে না মেরে মরবো না।"

সেই সময় তাঁদের সাহস ও রুখে দাঁড়ানোর জন্যই গুণ্ডারা তাঁদের বাড়িতে ঢুকতে সাহস করতো না। সংসারের কাজকর্ম করেও পার্টির কাজ, চিঠিপত্র নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার কাজ তিনি করতেন। এলাকার প্রতিরোধ বাহিনী গড়তে সাহায্য করেন। বহু আক্রমণ প্রতিহত করে তিনি পার্টির কাজ করেছেন। ১৯৮২, ১৯৮৭ এবং ১৯৯১ সালে মেমারি থেকে পার্টির প্রার্থী হয়ে বিধানসভা নির্বাচনে দাঁড়ান। ১৯৮২ ও ১৯৮৭ সালে ৬৩.৯ শতাংশ এবং ১৯৯১ সালে ৬০.৯৯ শতাংশ ভোট পেয়ে তিনবার বিধায়ক হয়েছিলেন।

১৯৯২ সালে আমাদের এলাকায় একটি ঘটনা ঘটে যায়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে কৃষক নেতা বিনয় কোঙার আমায় তার মেমারির বাড়িতে ডেকে পাঠান। অফিস থেকে সন্ধ্যার

—এরপর চারের পাতায়

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস এবং বর্তমান ফিলিস্তিন

শ্রীঅনিমেষ

গত ১০ ডিসেম্বর সারা বিশ্বের রাষ্ট্রসংঘের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলিতে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস পালন করার আহ্বান জানায় রাষ্ট্রসংঘ। প্রতি বছরের মতো ২০২৩ সালের থিম ঘোষণা করা হয়। থিম ছিল 'সকলের জন্য স্বাধীনতা, সমতা এবং ন্যায়বিচার'।

মানবাধিকার নিয়ে মানুষের লড়াই দীর্ঘদিনের। ৫৩৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে পারস্যের রাজা দ্বিতীয় সাইরাস ব্যাবিলন দখল করে ব্যাবিলনীয়দের দ্বারা নির্যাতিত মানুষদের মুক্ত করে তাদের নিজ নিজ ঘরে ফিরে যেতে সাহায্য করেন। এই সময় তাঁর নির্দেশে এক সিলিন্ডার তৈরি হয় যাকে প্রথম মানবাধিকার সনদ বলা হয়।

৬২২ খ্রিস্টাব্দে পয়গম্বর হজরত মহম্মদ ৪৭ অনুচ্ছেদের একটি মদিনা সনদ তৈরি করেন। এই সনদের দ্বারা প্রত্যেক ধর্মের মানুষদের নিজ নিজ ধর্ম পালনের এবং বসবাস সহ মানবাধিকার দেওয়া হয়।

১২১৫ সালের ১০ জুন ইংল্যান্ডের রাজা জন প্রথম ব্যারণ যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে একটি সনদ তৈরি করান। ১৫ জুন ২৭ জন ম্যাগনেট দ্বারা তৈরি হয় এই সনদ। যাকে 'ম্যাগনা কার্টা' সনদ (স্বাধীনতার মহান সনদ) পত্র বলা হয়। এই সনদটিকেই মানবাধিকারের চাবিকাঠি বলা হয়ে থাকে। এই সনদ তৈরির পিছনে শতশত বছরের রক্তাক্ত ইতিহাস জড়িত আছে। পরবর্তীকালে ১২১৭ সালের ১২ এবং ১৩ সেপ্টেম্বর রচিত হয় কিংসল্টনের চুক্তিপত্র। ১৬২৮ সালে তৈরি হয় 'পিটিসন অব রাইটস্'। ১৭০১ সালে অ্যাক্ট অব সেটেলমেন্ট।

১৭৭৬ সালের ৪ জুলাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীনতা ঘোষণা করার পর মানবাধিকার প্রশ্নটি আবার সামনে আসে। ১৭৯১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে দশটি সংশোধনীর মাধ্যমে গৃহীত হয় 'বিল অব রাইটস'। ইতিমধ্যে ১৭৮৯ সালে ফ্রান্সের ঘোষণাপত্র এবং ১৭৯১ সালে ফরাসি দেশের বিপ্লবোত্তর প্রথম সংবিধানেও মানবাধিকার বিষয়টি স্বীকৃত হয়।

১৯৪৩ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন মিত্রশক্তির দেশগুলির তেহরান সম্মেলনে জাতিসংঘ তৈরি করার বিষয়ে আলোচনা করেন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল, সোভিয়েত রাশিয়ার প্রধান যোসেফ স্টালিন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডেলানো রুজভেল্ট। রুজভেল্টকে চেয়ারম্যান করে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের একটি কমিটিও তৈরি হয়। তাঁদের মানবাধিকার বিষয় নিয়ে আলোচনা করার আহ্বান জানানো হয়। তাঁরা একটি সনদও তৈরি করতে থাকেন। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর সারা বিশ্বের অনুভূত হয় মানবাধিকার প্রশ্নটি। বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত মানুষদের ওপর যেভাবে অত্যাচার চালানো হতো, তা ছিল অমানবিক। নৃশংস ভাবে হত্যা, গ্যাসচেম্বারে নিক্ষেপ, জেলবন্দি এবং তাদেরকে পশুদের মতো আচরণ যে-কোনো বিবেকবান মানুষের মনে আতঙ্ক এবং অমানবিক বিষয়গুলো ভীষণভাবে দাগ কেটেছিল। ইতিমধ্যে ফ্রাঙ্কলিন ডেলানো রুজভেল্ট (১২.৪.১৯৪৫) প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর স্ত্রী আমেরিকার ফার্স্টলেডি এলিয়ানর রুজভেল্ট আমেরিকার প্রতিনিধি হয়ে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে মানবাধিকার সনদ প্রস্তুতির জন্য ১৯৪৬ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি একটি সভায় মিলিত হন এবং একটি রিপোর্ট তৈরি করে রাষ্ট্রসংঘে জমা দেন। ১৯৪৬ সালের এপ্রিলে এলিয়ানর রুজভেল্ট মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন হন।

১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর ফ্রান্সের প্যারিসের প্যালেস দ্য স্যাল্যোটে রাষ্ট্রসংঘের তৃতীয় অধিবেশনে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক (রেজিলিউশন ২১৭) এই ৩০ ধারা বিশিষ্ট মানবাধিকার সনদটি Universal Declaration of Human Rights (UDHR) গৃহীত হওয়ার ফলে ব্যক্তিমানুষের মৌলিক অধিকার, মর্যাদা এবং বিভিন্ন দেশের প্রেক্ষিতে ব্যক্তি মানুষের সমতার মতো বিষয়গুলি মর্যাদা পায়। সমাজ উন্নয়নের এবং উন্নত জীবনমান গড়ে তোলার লক্ষ্যে চলার সিদ্ধান্ত হয়।

মানুষ হিসাবে বাঁচার অধিকারই মানবাধিকার। সুস্থভাবে উন্নত জীবন গড়তে তাই কিছু অধিকার প্রয়োজন। ১৯৬৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় আরও তিনটি অধিকারকে সনদে যুক্ত করা হয় : (১) নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের প্রতি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি (২) অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এবং (৩) বিভিন্ন ধরনের জাতিগত বৈষম্য দূরীকরণের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। পরবর্তীকালে ১৯৮১ সালের ৩ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রসংঘের সভায় নারীদের প্রতি সর্বধরনের বৈষম্য বিলোপের সনদ গৃহীত হয়। ১৯৯৫ সালে বেজিং-এ সাধারণ সভায় 'নারীর অধিকার মানবাধিকার' এই কথাটি ঘোষিত হয়।

আজ ইসরাইলের সেনাবাহিনী কর্তৃক ফিলিস্তিনি জনগণের উপর, বিশেষ করে নারী ও শিশুদের উপর চলছে নৃশংস হত্যা, অত্যাচার। বোমা, গুলিতে ধ্বংস করা হচ্ছে ঘরবাড়ি, গীর্জা, মসজিদ, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, ত্রাণশিবির।

ত্রাণশিবিরগুলিতে থাকা অসহায় মানুষদের জন্য রাষ্ট্রসংঘের দেওয়া খাদ্য, পানীয় জল বন্ধ করা হচ্ছে, বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে অন্ধকারে রেখে দফে দফে মেরে ফেলা হচ্ছে, তখন মানবাধিকারের প্রশ্নটি বড় করে দেখা দিয়েছে।

রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক সেবা প্রতিষ্ঠানগুলি এ যুদ্ধ বন্ধ করার আহ্বান জানাচ্ছে। ইসরাইল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কিছু পশ্চিমীদেশ বাদ দিয়ে বিশ্বের সব দেশ চাইছে যুদ্ধ বন্ধ হোক, অসহায় মানুষগুলোকে বাঁচাতে। রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব তাদের সনদের ৯৯ ধারা প্রয়োগ করে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যদের বৈঠকে বসতে বাধ্য করলেও দেখা যাচ্ছে নিরাপত্তা পরিষদের সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হচ্ছে। ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজায় অবিলম্বে মানবিক যুদ্ধবিরতি ও বন্দিদের নিঃশর্ত মুক্তির আহ্বান জানিয়ে নিরাপত্তা পরিষদের উত্থাপিত প্রস্তাব ভেটো প্রয়োগ করে আটকে দিয়েছে আমেরিকা, ইসরাইল তাকে সাধুবাদ জানিয়েছে। নিরাপত্তা পরিষদের ১৫টি সদস্যের মধ্যে ১৩টি দেশ প্রস্তাবের পক্ষে থাকলেও ব্রিটেন ভোটদানে বিরত থাকে আর আমেরিকা ইসরাইলের পক্ষে ভোট দেয়।

রাষ্ট্রসংঘ, নিরাপত্তা পরিষদ, ইউনিসেফ, ইউনেস্কো সহ সকল বিভাগ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ফ্রান্স, রাশিয়া, চীন, ইরাক, ইরান সহ পৃথিবীর ১৮০ দেশ চাইছে শান্তি, যুদ্ধবিরতি। একমাত্র আমেরিকা যুদ্ধবিরতির পক্ষে নয় তাই ইসরাইল তাদের ধন্যবাদ দিয়েছে, হামাসকে শেষ করার নাম করে সাধারণ মানুষদের হত্যা করছে নির্বিচারে। এই মুহূর্তে ২৫০০০ মানুষ নিহত। আর এর ৭০ শতাংশ হলো নারী এবং শিশু। ফিলিস্তিনের পক্ষে ইসরাইলের বিরুদ্ধে বহু দেশে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মানুষ মিছিল করছে, মিছিলে আওয়াজ উঠছে ইসরাইল নিপাত যাক, ইসরাইল ধ্বংস হোক। অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি করতে হবে। কানাডা লন্ডনের রাস্তায়, নিউইয়র্কেও যুদ্ধবিরোধী মিছিল হচ্ছে। ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতা নিয়াহু হুঙ্কার দিচ্ছে চাই আরও রক্ত, নারী-শিশু-যুবক-বৃদ্ধর প্রাণ! তাই অনেকেই বলছেন 'বেঞ্জামিন নেতা নিয়াহু আর অ্যাডলফ হিটলারের মধ্যে কোনো ফারাক নেই'।

ইউনিসেফ বলছে গাজা এখন শিশুদের কবরস্থান। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা 'হু' উদ্বিগ্ন। হাসপাতালে বোমা ফেলছে ইসরাইল, অবরুদ্ধ গাজায় আল-আহলি হাসপাতালে ইসরাইলি বোমায় নারী ও শিশুসহ ৫০০ জন নিহত হয়। আল-সিফা হাসপাতালের নিচে হামাসের গোপন সুড়ঙ্গ আছে বলে হাসপাতালটি ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। নির্বিচার হামলায় নিহত মানুষের সংখ্যা ও ধ্বংসের ব্যাপকতা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে।

ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী হামাস প্রতিরোধী শক্তি নিয়ে লড়াই করে যাচ্ছে।

১৮৯৬ সালে যায়নবাদের প্রবর্তক থিওডোর হার্জল প্রকাশ করেন তাঁর গ্রন্থ 'দ্য মিউস স্টেট'। তাতে ইহুদি রাষ্ট্রের কথা বলা হয়। ১৮৯৭ সালে সুইজারল্যান্ডের বেসেলে থিওডোর হার্জেলের নেতৃত্বে যায়নিস্ট কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বসে যে তত্ত্ব হাজির করা হয় তাকে বলা হয় যায়নবাদ। সেই কংগ্রেসে সিদ্ধান্ত হয় ফিলিস্তিনের মাটিতে প্রতিষ্ঠা করতে হবে ইহুদিদের নিজস্ব রাষ্ট্র। তিনি বলেছিলেন 'আমি এই বেসেলে বসে যে ইহুদি রাষ্ট্র তৈরির নক্সা তৈরি করলাম নিশ্চিতভাবেই তা ৫০ বছরের মধ্যে বিশ্বের মানুষ উপলব্ধি করবে। তিনি ১৯০১ সালের মে মাসে ওসমানি খলিফা আবদুল হামিদকে চিঠি পাঠিয়ে প্রস্তাব দিয়েছিলেন ইহুদিদের জন্য বাইতুল মুকাদ্দামের কাছে কিছু জমি বরাদ্দের জন্য। খলিফা আবদুল হামিদ বলেছিলেন 'ফিলিস্তিনের ভূমি আমার একার সম্পদ নয় যে আমি লিখে দেব। প্রতিটি মুসলমানের রক্তের ফোঁটাতে এর মালিকানা। আমি বেঁচে থাকতে সেটা হতে দিতে পারি না।'

তবে অন্ধকার রাস্তায় আলোর কিরণ খুঁজে পায় যখন বিশিষ্ট রসায়নবিদ ও ব্রিটেনের ইহুদি নেতা চইম উইজম্যান ১৯০৭ সালে ফিলিস্তিনে প্রবেশ করেন। তিনি ফিলিস্তিনের জাফা এলাকায় কোম্পানি খোলেন। তিনি ইহুদি জাতীয় তহবিল খুলে সেই অর্থ দিয়ে ফিলিস্তিনে ইহুদিদের উপনিবেশ স্থাপনের জন্য জমি কিনতে শুরু করেন। যার জেরে মারজ বিন আমেরে ৬০ হাজার ফিলিস্তিনি তাদের বাড়িঘর ছাড়তে বাধ্য হয়। ইহুদিদের নিজস্ব 'হাগানা বাহিনীর' অত্যাচারে ফিলিস্তিনিরা ভীত হয়ে পড়ে। ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে অটোম্যান সাম্রাজ্যের পতনের পর ফিলিস্তিন ব্রিটিশদের অধিকারভুক্ত হয়। সেই সময় ফিলিস্তিনে মুসলিমরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং অল্প সংখ্যক ইহুদির বসবাস ছিল।

১৯৪০ সালের সময় হিটলারের জেরে ইউরোপ থেকে ইহুদিরা দলে দলে পালিয়ে এসে ফিলিস্তিনে আশ্রয় নেয়। ইউরোপের খ্রিস্টানরা যখন ইহুদিদের কচুকাটা করছিল তখন ফিলিস্তিনের মুসলিমরা তাদের নিরাপত্তা দেয়। আশ্রয় দিয়ে কোলে তুলে নেয়। তারা এতটা বিধ্বস্ত ছিল যে তাদের পরনের কাপড়টুকু ছাড়া কিছুই নিয়ে আসতে পারেনি। ফিলিস্তিনিরা দয়া দেখিয়ে তাদের আশ্রয় দিয়েছিল তাদের বুকে।

ব্রিটেন এবং আমেরিকার পরামর্শ মতো রাষ্ট্রসংঘকে কাজে লাগিয়ে ১৯৪৭ সালের ২৯ নভেম্বর ফিলিস্তিনকে ভাগ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, ব্রিটিশদের হাতে থাকা ফিলিস্তিনকে (ভারতের মতো) দু-ভাগে ভাগ করে একটি ভাগ ইহুদি রাষ্ট্র করার জন্য বরাদ্দ হয়। এই পরিকল্পনা ঘিরে বাক্‌বিতণ্ডা শুরু হয়। যুদ্ধও বেঁধে যায়। ইহুদিদের প্রকৃত ভূখণ্ড কিভাবে সেই সমস্যা সমাধান না করেই কৌশল করে ব্রিটিশরা ফিলিস্তিন ছেড়ে চলে যায়।

১৯৪৮ সালের ১৪ মে রাত্রি ১২টা ১ মিনিটে ইসরাইলের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ডেভিড বেন-গুরিয়ন ইসরাইল রাষ্ট্র গঠনের কথা ঘোষণা করেন। ২ ঘণ্টার মধ্যে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি হ্যারি এস ট্রুম্যান ইসরাইল রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেন। ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে গঠিত হয় ইহুদিতে ইসরাইল রাষ্ট্র।

১৯৪৭ সালে রাষ্ট্রসংঘ যে বিল পাশ করে তাতে ফিলিস্তিনের ৫৬ শতাংশ ভূখণ্ড দেওয়া হয় ইসরাইলকে, বাকি ৪৪ শতাংশ জমি পায় ফিলিস্তিনিরা। ইসরাইল রাষ্ট্র গঠনের জন্য ইহুদিরা কয়েকশত ফিলিস্তিনি নরনারীকে নির্মমভাবে গণহত্যা করেছিল, যাকে ইতিহাসে 'ডের ইয়াসিন' ঘটনা বলা হয়। ওই গ্রামের কয়েক শত নারী ও শিশুকে নগ্ন করে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে একসঙ্গে গুলি চালিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। সেই নির্মম দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করে সারা বিশ্বের মানুষের কাছে পরিবেশন করা হয়েছিল। সেই সময় যারা প্রতিবাদ প্রতিরোধ করেছিল তাদের 'হাগানা বাহিনী' দিয়ে নির্যাতন চালিয়ে কারাগারে নিক্ষেপ করে। ঘরবাড়ি ছাড়া করে প্রতিরোধ বন্ধ করেছিল। কঠোর হাতে দমন করা হয় আরবদের সেই বিদ্রোহ। ১৯৪৮ সালের ১৫ মে থেকে দীর্ঘ আট মাস ধরে এই প্রতিরোধ যুদ্ধ চলেছিল। ইসরাইল বাহিনী যুদ্ধে জয়ী হয় ব্রিটিশদের সহায়তায়। ফলে ৭ লক্ষ ৫০ হাজার ফিলিস্তিনি বাস্তুচ্যুত হয়েছিলেন। এই ঘটনাকে 'আল নকবা' বা বিপর্যয় হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এই যুদ্ধে ২৫০০০ ইসরাইলি এবং ৯১,১০৫ জন ফিলিস্তিনির মৃত্যু ঘটে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

বাবা-মার সঙ্গে শিশুরাও পরিযায়ী শ্রমিক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১২ জানুয়ারি : যাদের এখন স্কুলে পড়াশোনা করার কথা, সেই শিশুরাও এখন অধিকাংশ ইটভাটাগুলিতে বাবা- মার সঙ্গে পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে উঠেছে। সেই ছবি ধরা পড়লো কালনার একটি ইটভাটাতে। এই বাংলায় ইট শিল্পে বহু কর্মসংস্থান থাকা সত্ত্বেও বাংলার কোনো শ্রমিক এই কাজে পারদর্শী হয়ে উঠতে পারেননি। তাই বিহার ঝাড়খাণ্ড প্রভৃতি রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকরা এখানে এসে ইট শিল্পে কাজ করেন বহু পূর্ব থেকেই। আজও তা অব্যাহত রয়েছে। ভিন রাজ্যের শ্রমিকরা সপরিবারে এখানে আসেন। তাদের ছেলেমেয়েরাও সাথে থাকে।

বিগত বামফ্রন্ট সরকার ইট শিল্পের সঙ্গে জড়িত শ্রমিকদের ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনার কথা ভেবেছিল। কিন্তু এখন আর তা নেই। ফলে এই শ্রমিকদের ছেলেমেয়েরা শিক্ষার বাইরেই পড়ে রয়েছে। তারা এখন কেউ কেউ বাবা-মার সঙ্গে ইট নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে। কালনার একটি ইটভাটাতে দুই শিশুকে কাঁচা ইট উল্টাতে দেখা গেল।

সেচের কাজে চালু হলো সৌর চালিত পাম্প

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৩ জানুয়ারি : কালনা মহকুমায় কৃষি ক্ষেত্রে সেচের জন্য প্রথম চালু হলো সোলার চালিত পাম্প। এতে সেচের জন্য কৃষকদের অনেকটাই ব্যয় কমবে বলে কৃষি আধিকারিকদের মত। কারণ এই পাম্প চালাতে বিদ্যুৎ বা ফুয়েলের প্রয়োজন হবে না। কালনা মহকুমা কৃষি দপ্তরের সহ আধিকারিক ডক্টর পার্থ ঘোষ জানান, এই মহকুমায় চারজন কৃষককে সরকারি ভর্তুকিতে সোলার পাম্প দেওয়া হয়েছে। পাম্পগুলি ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করেছে।

বোরো ধানের বীজ বাঁচাতে কৃষকদের উদ্যোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১১ জানুয়ারি : শীত এবং ঘন কুয়াশা দেখা দিতেই বোরো ধানের বীজ বাঁচাতে কৃষকরা উদ্যোগী হয়ে উঠেছেন। তাঁরা সন্ধ্যাবেলা পলিথিন দিয়ে বীজতলা ঢেকে দিচ্ছেন আর সকাল বেলা পলিথিন খুলে দিচ্ছেন। আবার কেউ কেউ পলিথিনের পরিবর্তে সন্ধ্যাবেলায় পাম্পের টাটকা জল বীজতলায় ঢুকিয়ে দিচ্ছেন। সকালে সে জল বীজতলা থেকে বের করে দিচ্ছেন।

বিজ্ঞান চেতনা প্রসারে পথসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসী, ১১ জানুয়ারি : সারা ভারত জনবিজ্ঞান নেটওয়ার্কের আহ্বানে সারা দেশের চল্লিশটি রাজ্য ভিত্তিক জনবিজ্ঞান সংগঠন ম্যাডাম কুরি ও সি ভি রমনের জন্মদিন, ৭ নভেম্বর থেকে বিজ্ঞান-চেতনা প্রসার অভিযানে সামিল হয়েছে। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ জাতীয় বিজ্ঞান দিবসে কলকাতায় কনভেনশনের মাধ্যমে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষিত হবে। তারই অঙ্গ হিসেবে জীবন-জীবিকা, যুক্তিবাদ ও মুক্তচিন্তার অধিকার রক্ষা এবং জল-জমি-বন-বিদ্যুতের অধিকার রক্ষায় বিজ্ঞানের কথা তুলে ধরে সমস্ত জলাভূমি সহ দামোদর-অজয় বাঁচানোর দাবিতে গতকাল বিকাল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে দুর্গাপুর সিটিসেন্টার, অম্বুজা কলোনী ও চতুরঙ্গ মাঠের মোড়ে তিনটি পথসভার আয়োজন করে ডাঃ কাদম্বিনী গাঙ্গুলী বিজ্ঞান কেন্দ্র। বক্তব্য রাখেন রাজ্য কমিটির সদস্য রামপ্রণয় গাঙ্গুলী ও সম্পাদক কে এফ আর সিদ্দিকী।

অরূপ চ্যাটার্জির স্মরণসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১০ জানুয়ারি : প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে সিপিআই(এম)-এর নেতা অরূপ চ্যাটার্জিকে স্মরণ করা হয়। তিনি গত ২১ ডিসেম্বর কালনা দুই ব্লকের বড়ধামাস গ্রামের বাড়িতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বড়ধামাস গ্রামে অনুষ্ঠিত স্মরণ সভায় তার স্মৃতিচারণা করেন মহিলা নেত্রী অঞ্জু কর, শ্রমিক নেতা সুকান্ত কোনার, সুকুল শিকদার সনাতন টুডু

প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন সিপিআই(এম)-এর কালনা-২ এরিয়া কমিটির সম্পাদক মহম্মদ শাহ।

সিপিআই(এম) নেতার জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ৮ জানুয়ারি : সিপিআই(এম)-এর পূর্বস্থলী-২ এরিয়া কমিটি এলাকার পার্টি নেতা মাহমুদুল হক (৭৭)-এর জীবনাবসান হয়েছে। খবর পেয়ে তার বাড়িতে শ্রদ্ধা জানাতে যান পার্টি নেতা, কর্মী ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা। রক্তপতাকা ও পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। ছাত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পার্টির সংস্পর্শে আসেন প্রয়াত মাহমুদুল হক। ১৯৮৩ সালে তিনি পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। আমৃত্যু তিনি সেই পদেই আসীন ছিলেন। পরে কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তিনি খাসজমি দখল ও খেতমজুরদের মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলনে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। শ্রেণিশত্রুদের হাতে তিনি বারবার আক্রান্ত হয়েছেন। পাশাপাশি মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়েও তাঁকে দমানো যায়নি। তিনি দীর্ঘদিন পূর্বতন পূর্বস্থলী

লোকাল কমিটির সদস্য ছিলেন এবং সারাভরত কৃষকসভা পূর্বস্থলী-২ ব্লক কমিটির সম্পাদক ছিলেন। একবার জেলা পরিষদে নির্বাচিত হন এবং একবার পঞ্চায়েত সমিতিতে জয়ী হয়ে সহ-সভাপতি পদ অলংকৃত করেন।

কালনায় সংগীতানুষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা, গ্রেফতার-৪

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১১ জানুয়ারি : কালনা শহরে অনুষ্ঠিত এক সঙ্গীতানুষ্ঠানে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। আহত হয় বেশ কয়েকজন দর্শক। অবস্থা স্বাভাবিক করতে পুলিশকে লাঠিচার্জ ও গ্রেপ্তার করতে হয় কয়েকজনকে। ঘটনাটি ঘটেছে ১১ জানুয়ারি রাতে রূপম ইসলামের সঙ্গীতানুষ্ঠানে।

পাখি-চোখ-৬০

রত্না রশীদ

বছর শুরু হতে না হতেই গুণীজন মান্যজন যেন মিছিল করে অগস্ত্য যাত্রায় চলে যেতে শুরু করলেন। পৃথিবীকে যাঁরা সমৃদ্ধ করেন, তাঁদেরই যেন চলে যাবার তাড়া বেশি। এঁরা নিজ কৃতসুকর্মে আপনি অমর। আমরা ঘটাপটা করে শোকজ্ঞাপন করে কর্তব্য সারি, এটুকুই। এটাই সহজ। মহাজ্ঞানী মহাজনকে পুজোর ফুল ছুঁড়ে দেবার চেয়ে সহজতম শ্রদ্ধা জানানোর পন্থা আর নেই।

ফটো টাঙিয়ে ফুল মালা ধূপ দিয়ে সামনে একটু ঠোঙা সুদ্ধ সন্দেশ রেখে দিলেই খুব শ্রদ্ধা হলো। খানিক বাদে ভাগাভাগি করে সন্দেশ খেয়ে নিলেই পুজো শেষ, সমসংখিতি হজম। মহামানবের চিন্তা-ভাবনা-জীবনবোধ ইত্যাদি চর্চা ও অনুসরণ করা পুজো ও প্রাণায়ামের মতো সহজ কাজ নয়, এটা পরিশ্রমবিমুখ বেশিরভাগ মানুষের ক্রিয়াকর্ম দেখলেই তো বাইরে থেকেই বোঝা যায়। চর্চা ও অনুসরণ বাইরে থেকে দৃশ্যমান নয়। অনুসরণ করলে তবু কিছুটা মোটা চোখে ধরা পড়তে পারে। তবে অনুকরণে বেশিরভাগ সময়েই শিব গড়তে বাঁদর গড়া হয়ে যায়। ওমুক 'বড়ো মানুষ' হুঁকো টানতেন, তাই হুঁকো এক সম্মানীয় ও মননীয় বস্তু হয়ে দাঁড়ালো। এবং হুঁকো এক পূত পবিত্র অনুসরণীয় পন্থা। ফলত হুঁকো-বাদ জিন্দাবাদ। তবে ভেবে দেখার প্রয়োজন এই হুঁকো-সেবা কি আদৌ অন্ধ ভক্ত আমি ব্যক্তিটির অথবা আমিকেন্দ্রিক পরিবার সমাজ-এর কোনো উপকারে আসছে, না কি উল্টে তাকে অন্ধকার কুসংস্কারময় গভ্ডালিকায় ঠেলে ফেলে দিচ্ছে। গেরুয়া পরলেই কি আমি হাতজোড় করে পেন্নাম ঠুকে দিতে পারি? আমাকে দেখে আমার ছেলেমেয়ে পাড়া-প্রতিবেশীও তো তাই শিখবে। পেন্নাম ঠুকলেই ভক্তি দেখানো হলো তো বটেই, এটাও প্রতিষ্ঠিত হলো ওই বিশেষ পোষাকধারী মানেই খুব মান্যজন—প্রণম্যজন। অজস্র বিদ্বেষবাণী, কুসংস্কার প্রচারককে আমি মহাপুরুষের জায়গায় বসিয়ে ফেললাম, এবং একা আমার নিজেরই নয়, আমার দশ দিকের সর্বজনকে বোকা অন্ধ ও গোঁড়া বানিয়ে ফেললাম।

এমত অন্ধ যুক্তিহীন ভক্তিবাদ চলছে তো চলছেই। এই বাবাজী মাতাজি গুরুজিরা পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে নিজেরা দুধ ছানা-ননী গড়া পেলব চেহারায় 'বাণী' বিতরণ করেন। এদের পেসাদ পায় এদের চ্যালা চামুণ্ডা পাণ্ডাজনেরা। প্রচার করে যা লাভ হয় তার ভাগ মারে। গরিব ও সরলবিশ্বাসী মানুষজন ভক্তিবাদের পাল্লায় পড়ে নিজেদের যৎসামান্য উপার্জন এই ছারপোকাগুলোর রক্তচোষা উপাসনালয়গুলোতে ঢেলে দিয়ে আসে। এই চলছে বংশ পরম্পরায়। নিত্যি নতুন 'মহাপুরুষ' গজাচ্ছে—অগণন উপাসনালয়—তার সোনার দরজা, মনি মানিক্যের অলঙ্করণ। নিম্নমানের ভোগবাদের চূড়ান্ত।

এই মুহূর্তে যদি এর উল্টোদিকে সবাইকে নিয়ে ছুটতে শুরু না করি তো আমাদের ধ্বংস আটকাতে পারবে না কেউই। ভক্তিবাদ-ভোগবাদ উচ্ছন্নবাদের দিকে ঠেকে নিয়ে যায়। এর বিপরীতে কর্মবাদ হোক আমাদের অবলম্বন। আমার রোজগার আমার পরিবার, সমাজ-স্বজন, আমার দেশের কাজে লাগুক। রক্তচোষা ছারপোকাদের জন্য আমার শ্রমকে উৎসর্গ করা অপরাধ-এর অন্য নাম।

ভক্তিবাদ তথা ভোগবাদ নিপাত যাক নিপাত যাক। কর্মবাদ হোক আমাদের সহায়। (চলবে)

পটলের ভাঙ্গা মাচা সারাচ্ছেন চুনারাম টুডু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৯ জানুয়ারি : গত মরশুমে পটল চাষে লাভ হয়নি। তা সত্ত্বেও ভাঙা মন নিয়ে ভাঙা পটলের মাচা সারাচ্ছেন চুনারাম টুডু। কালনার হাটকালনা গ্রাম পঞ্চায়েতের রংপাড়ার চুনারাম টুডু প্রতিবছরই পটল চাষ করেন। এবারও তিনি এই চাষে মন লাগিয়েছেন। চুনারামের জমিতে ইতিমধ্যেই পটলের নতুন গাছ বেরিয়ে পড়েছে। সেগুলিকে এখন মাচা ধরানোর কাজ করছেন চুনারাম টুডু। পাশাপাশি মাচা সংস্কারের কাজও চলছে। এই ভাবেই চলছে পটল চাষ।

'শশাঙ্ক বিল বাঁচাও কমিটি' আন্দোলন

—প্রথম পাতার পর

মুক্তচিন্তার প্রসার এবং জল, জমি, বন ও বিদ্যুতের অধিকারের কথা বলতে গিয়ে শশাঙ্ক বিলসহ বর্ধমান শহরের পুকুর, ডোবা বুজিয়ে ফেলার বিরুদ্ধে জনমত তৈরির আবেদন রাখেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. ভাস্কর গোস্বামী। অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি জলাশয় বিনষ্ট করলে কী কী ক্ষতি হতে পারে তা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। এ্যাসোশিয়েশন অফ হেলথ সার্ভিস ডক্টরস-এর পক্ষে ড. গীস্পতি চক্রবর্তী এই বিষয়ের উপর আলোকপাত করে সংগঠনের পক্ষ থেকে এই কর্মসূচির সাফল্য কামনা করেন। পরিবেশবিদ অধ্যাপক অপূর্বরতন ঘোষ পরিবেশে এই জাতীয় জলাশয়ের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে জানান আগামী প্রজন্মের স্বার্থে এই জলাভূমি আমাদের রক্ষা করতে হবে। পথসভায় সমস্ত বক্তাদের বক্তব্যের মূল সুরে শশাঙ্ক বিলের মতো বিশাল জলাশয় প্রকৃতিকে কিভাবে স্থিতিশীল রেখেছে সে বিষয়টি গুরুত্ব পায়। সারা বিশ্ব জুড়ে যখন পরিবেশ আন্দোলন জোরদার হচ্ছে—বিশ্ব উষ্ণায়ন, জলবায়ু পরিবর্তন, জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ নিয়ে সমগ্র মানব জাতি যখন প্রয়াস চালাচ্ছে তখন শশাঙ্ক বিল ভরাট করার চেষ্টা হলে এই মঞ্চ বড় আন্দোলনে নামবে বলে বক্তারা হুঁশিয়ারি দেন।

—প্রথম পাতার পর

অনুষ্ঠানে কুইভ লায়েড

১৯৭৫ এবং ১৯৭৯ সালে তাঁর নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইন্ডিজ পরপর দুবার বিশ্বকাপ জয় করে। বর্তমানে তিনি আইসিসি'র প্রতিনিধি হিসেবে আন্তর্জাতিক ম্যাচগুলোতে ম্যাচ রেফারির দায়িত্ব পালন করেন। এই মহান ব্যক্তিত্বকে দেখে সাতগাছিয়ার মানুষ আপ্লুত। এদিন তিনি সাতগাছিয়া হাই স্কুল প্ল্যাটিনাম জুবিলি ট্রফির ফাইনাল খেলার জয়ী ও বিজয়ী দলের হাতে ট্রফি তুলে দেন। তিনি এদিন নব্য ক্রিকেটারদের উদ্দেশ্যে বলেন, লক্ষ্য পূরণের জন্য কখনও শর্টকাটের পন্থা অবলম্বন করো না। পরিশ্রম করে যেতে হবে নিজের লক্ষ্য বা স্বপ্নকে পূরণ করার জন্য।

মহিলা নেত্রী মহারানী কোঙার

—দুয়ের পাতার পর

পর তাঁর বাড়ি যাই, তিনি সদর দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। বললেন, 'আয় ভিতরে আয়।' তারপর রানীকে হেঁকে বললেন—'রানী করিম এসেছে, ও সোজা অফিস থেকে আসছে, ক্ষিদে পেয়েছে, ওকে কিছু খেতে দাও।" রানীদি চালের পিঠে করেছিলেন, নিয়ে এসে বললেন—"আগে খেয়ে নে, তারপর গল্প করবি।" কী আন্তরিকতা সেই কথার মধ্যে সেকথা ২০০২ সালের আজও মনে পড়ে।"

২০০২ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র ১৯তম বর্ধমান জেলা সম্মেলন (রানীগঞ্জ) থেকে তিনি জেলা কমিটি সদস্যা নির্বাচিত হন।

২০১৯ সালের ২৩ আগস্ট রামনারায়ণদার স্ত্রী লতিকা গোস্বামীর মৃত্যু হয়। বৌদির মৃত্যুর খবর পেয়ে গাড়ি যোগাড় করতে না পেরে তাঁর পুত্র খোকনের মোটর সাইকেলে ভৈটা চলে আসেন। তখন চিতা সাজানো চলছে। গাশেই তেঁতুল গাছ। গাছের শিকড়ের উপর বসে বৌদির চিতা দেখছেন আর স্মৃতিগুলি মনের মণিকোঠায় ভেসে উঠছে। দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল চিতা। রাণীদির চোখে জল। কত স্মৃতির কথা তাঁর মনে পড়ে যাচ্ছিল। তারপর আস্তে আস্তে আমার হাত ধরে বৌদিদের বাড়ি গেলেন। কত স্মৃতির কথা আস্তে আস্ত বললেন! বললেন আমার বোন লতিকা চলে গেল, লতিকা ছিল দীর্ঘদিনের সাথী।

শেষ দেখা হয় ২৬ মে সংস্কৃতি লোকমঞ্চে। কৃষকনেতা মদন ঘোষের স্মরণসভায়। মঞ্চের একধারে চুপটি করে বসে বক্তাদের আলোচনা শুনছিলেন। আমাকে ডেকে বললেন, "একদিন আমাদের বাড়িতে আসবি, সারাদিন থাকবি। অনেক গল্প করবো।" যাওয়া আর হয়নি।

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ ঝা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক দিনেশ ঝা কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন : ৯৪৩৪২৫১৫৮৬। Mail : weeklynatunchithi@gmail.com মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪। মূল্য : ২ টাকা